গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ২৩ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ জানুয়ারি ২০২০ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

মহান লেনিন স্মরণে

২২ এপ্রিল ১৮৭০ - ২১ জানুয়ারি ১৯২৪

"পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা, ভণ্ড সোসালিস্টরা যারা শ্রেণিসংগ্রামের বদলে শ্রেণি-সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখে থাকে, তারা এমনও কল্পনা করে যে, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর শান্তিপূর্ণভাবে স্বপ্নের মতোই ঘটে যাবে। তারা এ রকম ভাবে না যে, শোষক শ্রেণির শাসন উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে। এরা বরং কল্পনা করে যে, উদ্দেশ্যসচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে সংখ্যালঘিষ্ঠ শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করবে এবং এভাবেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ হবে। রাষ্ট্র শ্রেণির ঊর্ধ্বে অবস্থিত— এই ধারণা থেকেই পেটি বুর্জোয়াদের ওই কল্পিত স্বর্গের উৎপত্তি।"

— লেনিন (রাষ্ট্র ও বিপ্লব)

'গো ব্যাক মোদি' ধ্বনিতে কাঁপল কলকাতা থেকে জেলা

১১ জানুয়ারি, বহুদিন পর কলকাতা তথা বাংলার সেই প্রায় হারাতে বসা প্রতিবাদী রূপ দেখল সারা ভারত— যে প্রতিবাদের জোয়ারে ভেসে গিয়েছিল লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের 'সেটেলড ফ্যাক্ট', যে আন্দোলন আন-সেটেলড করেছিল ইংরেজের বিভাজনের শয়তানিকে। নৃশংস অত্যাচার সত্ত্বেও যে গণপ্রতিরোধে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম থেকে টাটা-সালেমদের রক্তলোলুপ থাবা গুটিয়ে নিতে হয়েছে। এস ইউ সি আই (সি)-র নেতৃত্বে যে গণআন্দোলনে প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে শাসকরা।

আটের পাতায় দেখুন

১১ জানুয়ারি। এসপ্ল্যানেড

কাশ্মীরের বুকে মাথা তুলেছে অনেক দেওয়াল

সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ করে প্রধানমন্ত্রী জোর গলায় বলেছিলেন, কাশ্মীর আর বাকি ভারতের মধ্যে যে দেওয়াল ছিল তা আমি সরিয়ে দিয়েছি।

নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরা দেওয়াল ভেঙেছেন? কোথায়? কাশ্মীরের বুকে আজ অসংখ্য দেওয়াল। ছাত্রদের সামনে দেওয়াল, তারা স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না। উচ্চস্তরের পঠন পাঠন, গবেষণা আর সর্বভারতীয় পরীক্ষার নাগাল থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট বন্ধের দেওয়ালে। সাধারণ মানুষের চলা ফেরার উপর দেওয়াল, রাজধানী শ্রীনগর সহ সর্বত্র কাঁটাতারের বেড়ায় বন্দি মানুষ। দেওয়াল উঠেছে গোটা জগৎ আর কাশ্মীরের মধ্যে— দীর্ঘ পাঁচমাস স্তব্ধ ইন্টারনেট আর মোবাইল ফোন পরিষেবার বেশিরভাগ। সরকারি ভাষ্য পরিবেশন করে যারা, সংবাদমাধ্যমের সেই অংশটি ছাড়া বাকিদের সামনে অলঙ্ঘ্য নিষেধাজ্ঞার দেওয়াল। জীবনদায়ী ওষুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা বেচার সামনেও দেওয়াল তুলেছে ইন্টারনেটের অভাব। অসুস্থ মানুষ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে খাড়া হয়ে আছে এই দেওয়াল। তাই শ্রীনগরের অধ্যাপিকা তসলিমাকে বলতে হয়, 'এ পর্যন্ত ইন্টারনেট না থাকায় হাসপাতালে কত জনের মৃত্যু হয়েছে সেই হিসেবটা সরকার করেছে কি? সরকার কাশ্মীরে হত্যালীলায় মেতেছে' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১.১.২০২০)। অনেক দিন ঝুলিয়ে রেখে অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট ১০ জানুয়ারি এক রায়ে বলেছে, অনির্দিষ্টকালের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করা মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ। আরও বলেছে, বারবার ১৪৪ ধারা জারি করা ক্ষমতার অপব্যবহার। আদালতের অভিমত, যুক্তিসঙ্গত মত প্রকাশ ও বিক্ষোভ রুখতে দীর্ঘকাল ১৪৪ ধারা জারি করে রাখা যায় না (ওই, ১১.১.২০২০)। এই সামান্য কথাগুলিই তো বারবার বলার চেষ্টা করেছেন কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ। নিষেধাজ্ঞার দেওয়াল তুলে তাঁদের বক্তব্য গোটা ভারতের কাছে পৌঁছতে দেয়নি বিজেপি সরকার।

অথচ প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা একযোগে বলে চলেছেন, কাশ্মীর একেবারে স্বাভাবিক। কোথাও বিক্ষোভ নেই, সেনাবাহিনীর সাথে মানুষের সংঘর্ষও কমে গেছে। ৯৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী তাদের বাৎসরিক পরীক্ষা দিয়েছে। তাঁরা বোঝাচ্ছেন, কেন্দ্রের উদ্যোগে উন্নয়নের জোয়ার বইতে শুরু করল বলে!

উন্নয়ন?

অথচ বাস্তব কী বলছে? গত আগস্ট মাসের পর

দুয়ের পাতায় দেখুন

দেশ উত্তাল বিক্ষোভে দরকার বামপন্থী নেতৃত্ব

এমন করে যে অসমুদ্র-হিমাচল আন্দোলনে, প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠবে তা ছিল শাসকদের ভাবনার অতীত। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে শাসক শ্রেণির একের পর এক আক্রমণে শোষিত, নিপীড়িত মানুষ ক্ষোভে, ঘৃণায় শাসকদের উপর তেতে উঠছিল, এ কথা ঠিকই। তবু মানুষের ঝিমুনির কাটছিল না। আর এতেই শাসক শ্রেণি ধরে নিয়েছিল, তারা দেশের মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে, নৈতিক ভাবে পঙ্গু করে রাখতে, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে বুঁদ করে রাখতে, সবার উপরে, আন্দোলন বিমুখ করে রাখতে যে সব কায়দা নিয়ে চলেছে, মানুষের এই নিষ্ক্রিয় হতাশ মনোভাব বোধহয় তারই সুফল। অবশ্য সব যুগেই শাসকরা এমন ভ্রান্তিবিলাসে ভোগে যে তারা চিরকাল মানুষকে এমনই নিশ্চুপ আত্মসমর্পণের মধ্যেই আটকে রাখতে পারবে। তা যদি সত্যিই হত তবে সভ্যতার ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হত। শাসক শ্রেণি এবং তাদের তল্পিবাহকরা চায় এই ভাবেই তাদের ধূর্ততা, চাতুরি, স্বৈরাচার এবং দমনমূলক আচরণের দ্বারা জনগণের ইচ্ছা এবং তৎপরতাকে স্তব্ধ করে দেবে এবং ইতিহাসের অনিবার্য গতিপথকে আটকে দিয়ে ক্ষমতার গদিতে অটুট থাকবে। তারা স্মরণে রাখে না, জনগণের অন্তরে জমাট ক্ষোভের বারুদে একবার বিস্ফোরণ শুরু হলে তা এই সব তুচ্ছ প্রতিরোধকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে, ভেঙে ফেলবে শাসক শ্রেণির সব শৃঙ্খলকে। আজ তেমনটাই ঘটছে।

শাসক আরএসএস-বিজেপি এবং এবং তাদের প্রভু দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কীভাবে জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি থেকে লাভাস্রোত অবিরাম বেগে বেরিয়ে আসছে। নোট বাতিল এবং জিএসটি চালুর ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতি, ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধি, তেলের দামবৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের সুদ কমানো, পুঁজিপতিদের জন্য ব্যাপক করছাড়, কর্পোরেট করছাড়, ব্যাঙ্কগুলি থেকে নেওয়া বিপুল পরিমাণ ঋণ পুঁজিপতিদের ছেড়ে দেওয়া, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম না পাওয়া, বাড়তে থাকা কৃষক আত্মহত্যা, ব্যাপক বেকারি এবং ছাঁটাই, মহিলাদের উপর আক্রমণ, গোরক্ষার নামে গণহত্যার মতো অপরাধ বাড়তে থাকা, যথেচ্ছ মানবাধিকার হরণ, সর্বব্যাপক দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে জনমনে ক্ষোভের বারুদ জমা হয়ে চলেছিল। জনগণের এই ক্ষোভের কথা শাসকদের অজানা নয়। এই ক্ষোভকে ধামাচাপা দিতে, অর্থনীতির এই ভয়াবহ

ছয়ের পাতায় দেখুন

কাশ্মীরের বুকে অনেক দেওয়াল

একের পাতার পর

থেকে কাশ্মীরের ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যত শিকেয় উঠেছে। 'কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'-র রিপোর্ট বলছে, ৫ আগস্ট ৩৭০ ধারা উঠে যাওয়ার পর চার মাসে কাশ্মীরের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১৭,৮৭৮ কোটি টাকা। কাজ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৫ লক্ষ মানুষ (বর্তমান, ২১.১২.২০১৯)। কাশ্মীর মূলত কৃষিপ্রধান রাজ্য। এখানকার গ্রামীণ অর্থনীতি নির্ভর করে ফল, ফুল এবং শাকসবজি উৎপাদন ও বিক্রির উপর। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর থেকে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা সামরিক কবজায়। পুলিশ-মিলিটারির দাপাদাপির ফলে গোটা কাশ্মীরে যান চলাচল কার্যত বন্ধ। সারা দেশের ফল ব্যবসায়ীরা গত আগস্ট মাস থেকে কাশ্মীরের বাগানগুলিতে যেতে পারেননি। আঙুর-ন্যাসপাতি-চেরি ফল-আপেল বাগানে বাগানে পড়ে নষ্ট হয়েছে। যানবাহন নেই, ফলে তা দেশ-বিদেশের বাজারে পাঠানো যায়নি। পড়ে পড়ে মার খেয়েছেন চাষিরা। তাঁদের কান্নায় কিছুমাত্র যায়-আসে না অমিত শাহদের। এসব তাঁদের চোখে বোধহয় উন্নয়নের 'কো-ল্যাটারাল ড্যামেজ'! গত নভেম্বরে এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান সহ সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনগুলির ৭ জন প্রতিনিধি কাশ্মীর উপত্যকার গান্ধারবাল, গামপোল, পুলওয়ামা, কুলগাম এবং অনন্তনাগের চাষিদের বেশকিছু খামার ঘুরে দেখেন। তাঁরা কুলগামে কৃষকদের নিয়ে গণ-শুনানির আয়োজন করেন। ফল-ফুল চাষি সংগঠন ও বণিকসভার প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করার পর তাঁদের উপলব্ধি, চাষিদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

কাশ্মীরের অন্যতম প্রধান ব্যবসা পর্যটন। বড়দিন ও নতুন বছরের ছুটি কাটাতে, তুষারপাত সহ প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ করতে এই সময় দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক আসেন। কিন্তু এবার ছুটির এই মরশুমেও কার্যত খালি রইল কাশ্মীর উপত্যকা। বিশেষত স্কি-রিসর্ট গুলমার্গ। পর্যটন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতা ফারুক আহমেদ কুথুরের বক্তব্য, অন্যান্য বার এই সময় সমস্ত হোটেল, রিসর্ট পুরো ভর্তি থাকে, সেখানে এ বার মাত্র ১০-১৫ শতাংশ ভর্তি (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬.১২.১৯)। এত বিধিনিষেধ ও আতঙ্ক— এরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় পর্যটক আসবে কোন ভরসায়? তাই বিখ্যাত ডাল লেকের হাউসবোট, শিকারাগুলি খালি গত পাঁচ মাস ধরে। এভাবেই ধীরে ধীরে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে পর্যটন শিল্প— কাশ্মীরের অর্থনীতির 'জীবন রেখা'।

স্বাভাবিক?

কাশ্মীর এখন সংবাদ শিরোনামে নেই। আজ এনআরসি, সিএএ নিয়ে দেশজোড়া বিক্ষোভ আর বিতর্কের আবহ। তবে একটা প্রশ্ন দেশবাসীর মনে জাগছে, সরকারের দাবি অনুযায়ী যদি সবকিছু ঠিকঠাক চলে, কাশ্মীর যদি সত্যিই স্বাভাবিক হয়, তাহলে গত আগস্ট মাস থেকে তিনজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, ওমর আবদুল্লাহ ও মেহবুবা মুফতি সহ কাশ্মীরের প্রথম সারির সমস্ত নেতা ও বহু সংখ্যক রাজনৈতিক কর্মীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে কেন? সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে এই সংখ্যাটা প্রায় এগারোশো। এরা প্রত্যেকেই ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থার অংশীদার এবং কাশ্মীরের জনসাধারণের চোখে ভারতপন্থী নেতা বলেই পরিচিত। এর মধ্যে মেহবুবা মুফতির মুখ্যমন্ত্রীত্বে কাশ্মীরে সরকারের শরিক ছিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের তিন শতাধিক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাতের জেলগুলিতে আটকে রাখা হয়েছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের নৈনি জেলে বন্দি অবস্থায় একজন কাশ্মীরি নেতার মৃত্যুসংবাদ খবরে এসেছে।

তথ্যের অধিকার আইনে জম্মুর বাসিন্দা রোহিত চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০১৯-এর আগস্ট থেকে নভেম্বর — এই চার মাসে জম্মু-কাশ্মীরে বিক্ষোভ এবং সেনা-আধা সেনা বা পুলিশের দিকে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে তার সংখ্যা ১১৯৩। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের মন্ত্রক ৩ ডিসেম্বর লোকসভায় লিখিত উত্তরে বলেছিল, এই চার মাসে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটেছে ৩০৯টি, যেখানে গত বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাই— এই সাত মাসে তা ছিল ২৮২ (দ্য হিন্দু, ৬.১.২০২০)। প্রবল ঠাণ্ডাতেও বিক্ষোভের এই নমুনা দেখে সদ্য বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়া এক প্রবীণ কাশ্মীরি রাজনীতিকের আশঙ্কা —'মনে হচ্ছে উপত্যকায় এবারের গ্রীষ্ম রক্তাক্ত হতে পারে।...নানা সূত্রে গ্রীষ্মে রক্তপাতের ইঙ্গিত পাচ্ছি' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১.১.২০২০)

৫ আগস্ট থেকে, জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসন বড় বড় মসজিদগুলি বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধ হয়েছে বড় মসজিদে সমবেত নামাজ পাঠ। শুক্রবারের সমবেত নামাজ পাঠ একটানা বন্ধ রয়েছে শ্রীনগরের বিখ্যাত জামা মসজিদে। নমো নমো করে পালিত হয়েছে ঈদ। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদের জন্মদিনে প্রতি বছর অন্তত ৫০ হাজার মানুষ আসেন হজরতবাল দরগায়। এবারে তার অনুমতি দেওয়া হয়নি। জামা মসজিদের পাশে নওহাটার বাসিন্দা খালিদ বসির দুয়ার ভাষায়, 'সরকার এখন কাশ্মীরিদের যে কোনও জমায়েতকেই ভয়ের চোখে দেখছে'। এমনকি চরার এ শরিফের সুফি সম্প্রদায়ের দরগায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানুষকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। কাশ্মীর উপত্যকার প্রবীণ মানুষদের বক্তব্য, ১৯৮৯-৯০ সালে যখন উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, পাশাপাশি সরকারি দমন-পীড়ন সমানতালে চলেছিল, তখনও এরকম ঘটনা ঘটেনি।

জরুরি অবস্থা?

কাশ্মীর উপত্যকায় এখন যেন অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। সরকারি ও পেটোয়া সংবাদমাধ্যম ছাড়া অন্য সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। 'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের' সাংবাদিক ইয়াসিন দার গত ১০ ডিসেম্বর লিখেছেন,"গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক যখন শ্রীনগরে বন্ধ জামা মসজিদের ছবি তুলছিলেন, একজন স্থানীয় পুলিশ তাঁকে সাবধান করে বললেন, "আপনি এখান থেকে পালান। ওরা যদি এসে দেখে আপনি সাংবাদিক, ছবি তুলছেন তাহলে পেটাবে"। 'ওরা' মানে ভারতীয় সশস্ত্র আধা সামরিক বাহিনীর যে দলটা ৬০০ বছরের সুপ্রাচীন জামা মসজিদ পাহারা দিচ্ছে।

'দি গ্লোব' পত্রিকার এশিয়ার সংবাদদাতা নাথান ভ্যানডার ক্লিপ ২১ নভেম্বর পর্যটক হিসেবে কাশ্মীর উপত্যকা সফর করে তাঁর অভিজ্ঞতা লিখেছেন, "তুষারশুভ্র হিমালয়ের পাদদেশে, সবুজ গালিচার ওপর ঘোড়াগুলো চরছে। কোনও পর্যটক বা তীর্থযাত্রী নেই যাদের বহন করবে। ফলে মালিকদেরও কোনও আয় নেই কার্যত আগস্টমাস থেকে। বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক কয়েক মাস যাবৎ স্কুল বন্ধথাকার জন্য দৈনিক ১০০ টাকা মজুরিতে পাথর বহন করছেন। ছোট ছোট ছেলেরা সারাদিন রাস্তায় ক্রিকেট খেলছে, তাদের স্কুল নেই। রাস্তায় ট্রাফিক নেই। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে রোজগারের জন্য। কলকাতার মতো বড় শহরে তারা কাশ্মীরি শাল, গরম পোশাক বিক্রি করছে। স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা হলেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস কার্যত বন্ধ। রাস্তার ধারে সারি সারি দোকান রয়েছে, কিন্তু তাদের 'শাটার' নামানো। 'ভূস্বর্গ' কাশ্মীরের বাইরের শান্ত চেহারার নিচে জ্বলছে বিক্ষোভের ধিকি ধিকি আগুন। শ্রীনগর এখন স্তব্ধ— কলতান অদৃশ্য হয়ে শহরের বুকে চেপে বসেছে এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ— যেন কবরের নীরবতা! ডাল লেক থেকে শুরু করে আপেলের বাগান কোথাও কোনও ব্যস্ততা নেই। এরকম স্ব-আরোপিত 'হরতাল' কাশ্মীর কখনও দেখেনি। সরকার নিজেও ১১ অক্টোবর কাশ্মীরের সব সংবাদপত্রে প্রথম পাতা জুড়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছে, মানুষ নিজে থেকেই দোকান খুলছেন না, গণপরিহণ ব্যবহার করছেন না, সরকারের কাছে আসছেন না। প্রশ্ন করেছে, 'কীসের ভয়?" (এনডি টিভি ১১.১০.২০১৯)।

তাই বন্ধ জামা মসজিদের গায়ে জ্বলজ্বল করছে ভারত সরকার বিরোধী দেওয়াল লিখন। ঝিলম নদীর তীর ঘেঁষে দেওয়ালে লেখা,'তোমরা আমাদের হত্যা করতে পারো, কিন্তু নোয়াতে পারবে না।' অনন্তনাগের পাহাড়ের নিচে দেওয়ালে লেখা,'আমাদের অধিকার ফিরিয়ে দাও'। ১৯৫০ সালে মুম্বইয়ের 'কারেন্ট' পত্রিকায় ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার খাজা মহম্মদ আব্বাস লিখেছিলেন, ভারত সরকার যদি কাশ্মীরের মন জয় করতে চায়, তাহলে তাদের নীতিনিষ্ঠভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে বজায় রাখতে হবে। আজকের ভারত সরকারকে দেখলে মনে হয়, এ নেহাতই দুরাশা!

৩৭০ ধারা বিলোপের মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের শেষ চিহ্নটুকু অপসারিত হওয়ার পর, কাশ্মীরি জনগণ ভারত সরকারের তরফে যে বিশ্বাসভঙ্গের বেদনায় ভুগছেন, তা নিয়ে ঠিক এই আশঙ্কাই ব্যক্ত করেছিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূলের মতো সমস্ত বিরোধী দলগুলি যখন ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরুদ্ধতার নামে শুধু পদ্ধতিগত প্রশ্নের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে, সেই সময় একমাত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ৬ আগস্টের (২০১৯) বিবৃতিতে বলেছিল, "একতরফা ভাবে জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ এবং রাজ্য হিসেবে তার মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কাশ্মীরবাসীকে আহত করবে, তাদের বাকি ভারত থেকে দূরে ঠেলে দেবে। এর সুযোগ নেবে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।" দুঃখের হলেও আজ বারবার সে আশঙ্কার সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন বিজেপি নেতৃত্ব কাশ্মীরের এই দেওয়াল লিখন পড়তে পারছেন কি?

জীবনাবসান

বেহালা পশ্চিম অঞ্চলের প্রবীণ পার্টি কর্মী কমরেড মুকুল নন্দী ৩০ ডিসেম্বর তাঁর বাসভবনে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। পাঁচের দশকে জগদ্দল শিল্পাঞ্চলে তিনি তাঁর মামাতো ভাই দলের পূর্বতন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সদানন্দ বাগলের মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। তিনি দলের যে কোনও প্রচার কাজে আনন্দের সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। সেই সময় হাওড়া-মেদিনীপুর লাইনে ট্রেনে হকারি করতে করতে গণদাবী বিক্রি করতেন। তখন মেদিনীপুরে দলের কাজ সবে শুরু হয়েছে। দলের তখনকার রাজ্য সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীকে তিনিই প্রথমে ওই অঞ্চলে নিয়ে যান। এরপর কেন্দ্রীয় কমিটির অপর সদস্য কমরেড হীরেন সরকারের সাথে তিনি ঘাটশিলায় কাজ করেন। ছয়ের দশকের শেষদিকে তিনি ব্রেথওয়েট কোম্পানিতে চাকরি করার সুবাদে বেহালা-পশ্চিমে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেও দলের কাজ করতে থাকেন।

পার্টি গঠনের শুরুর দিনগুলিতে দলের বক্তব্য এবং সেদিনের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের কঠোর জীবন ও সংগঠন গড়ে তোলার অদম্য প্রয়াস তাঁদের আশে-পাশে থাকা মানুষগুলোকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত, তাঁদের মধ্যে দলের প্রতি গভীর আবেগ সৃষ্টি করত। কমরেড মুকুল নন্দী দলের প্রতি সেই আবেগকে আজীবন বহন করেছেন। পরিবারকেও সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর দলের কর্মীরা তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হন। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন চক্রবর্তী এবং লোকাল সম্পাদক কমরেড ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

কমরেড মুকুল নন্দী লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার নামখানা অঞ্চলে দলের অন্যতম সদস্য কমরেড হরিপদ পড়ুয়া ২৯ ডিসেম্বর সকালে হঠাৎ সেরিব্রাল স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। প্রথমে জেলার দক্ষিণাঞ্চল স্বাস্থ্য সদন ও পরে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে বিফল করে ৩১ ডিসেম্বর হাসপাতালেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

অত্যন্ত দুঃস্থ এক পরিবার থেকে উঠে আসা কমরেড হরিপদ পড়ুয়া ১৯৮৭ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কমরেড প্রজাপতি খালুয়ার মাধ্যমে দলের সাথে যুক্ত হন। সেই সময় থেকে পার্টির অফিস সম্পাদক হিসাবে তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন।

দল কোনও কাজ দিলে যেমন তিনি পালন করতেন, তেমন আবার না দিলেও সৃষ্টিধর্মী মন নিয়ে স্বকীয় উদ্যোগে কাজ করে যাওয়ার গুণ ছিল তাঁর। মনীষীদের জীবনচর্চায় তাঁর উদ্যোগ ছিল প্রেরণাদায়ক। এ ছাড়াও নামখানা নেতাজি জন্মজয়ন্তী কমিটি, বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালন কমিটির দায়িত্বও পালন করেছেন।

নিজের পরিবারের সমস্ত সদস্যকে শুধু দলের কাজে যুক্ত করা নয়, তাঁরা যাতে সর্বক্ষণের কর্মী হতে পারেন সে ব্যাপারে প্রতিনিয়ত উৎসাহও দিতেন। প্রয়াত কমরেড গ্রামের মানুষের কাছে অত্যন্ত ভালবাসার পাত্র ছিলেন। বিপদে-আপদে সবার পাশে দাঁড়াতেন। ১ জানুয়ারি রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য কমরেড মাদার নস্করের তত্ত্বাবধানে তাঁর মরদেহ নামখানা পার্টি অফিসে পৌঁছালে শতশত মানুষ শেষ বিদায় জানানোর জন্য উপস্থিত হন। ১৩ জানুয়ারি নামখানা ভ্যাসেলঘাট সংলগ্ন রেস্ট হাউসে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড হরিপদ পড়ুয়া লাল সেলাম

‘প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা’র মুখবন্ধ

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

১৮৮৩ সালে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান শিক্ষক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রচনা করেন ‘প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতা’। এতে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বগত সমস্যাগুলির সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা দেন তিনি। রচনার মুখবন্ধে সমগ্র বিষয়টি চুম্বকে তুলে ধরেছিলেন এঙ্গেলস। তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে মুখবন্ধটি প্রকাশ করা হল। এবার তৃতীয় কিস্তি।

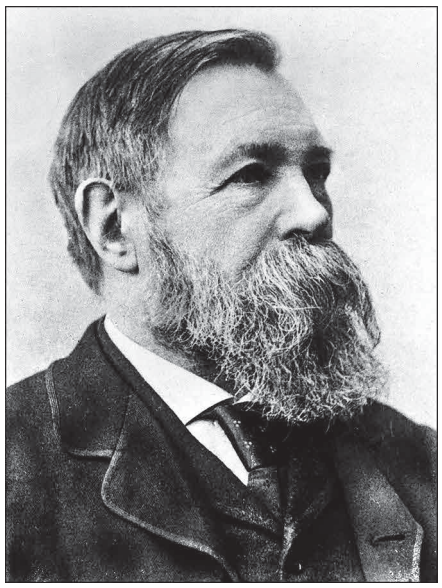

আমাদের এই মহাজাগতিক দ্বীপ, যার প্রান্ত ঘিরে রয়েছে ছায়াপথের নক্ষত্রমণ্ডলীর বেড়া, সেখানে অগণিত সূর্য ও সৌরজগত গড়ে উঠছে ঘূর্ণ্যমান দীপ্তিমান বাষ্পপুঞ্জের সংকোচন ও শীতলতাপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। এই বাষ্পপুঞ্জের গতির নিয়ম হয়ত ধরা পড়বে আরও কয়েক শতক ধরে তারাদের প্রকৃত গতি পর্যবেক্ষণের পর। স্বভাবতই এর বিকাশ সর্বত্র সমান গতিতে হয়নি। কিছু কিছু কৃষ্ণ বস্তুপিণ্ড— যা গ্রহ নয়, তাই তাকে নির্বাপিত নক্ষত্র বলে ধরা হচ্ছে— তার অস্তিত্বের কথা জ্যোতির্বিজ্ঞানের জানার আওতায় আসছে (ম্যাডলার)। অন্যদিকে (সেকির মতানুযায়ী) বাষ্পীভূত নীহারিকাপুঞ্জের একাংশ আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে অসম্পূর্ণ সব সূর্যের আকারে, এর ফলে— ম্যাডলার যা বলেন— এই অনুমান বাতিল হয় না যে, অন্য নিহারীকাগুলি হল সুদূরবর্তী স্বতন্ত্র মহাজাগতিক দ্বীপপুঞ্জ, যার বিকাশের আপেক্ষিক স্তরটি নির্ণীত হতে পারে স্পেকট্রোস্কোপ দ্বারা।

কীভাবে একটা স্বতন্ত্র নীহারিকা থেকে সৌরজগত গড়ে উঠেছে তা লাপ্লাস যেমন বিশদ ও চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন তা আজও অতুলনীয়। পরবর্তীকালের বিজ্ঞান তাঁর কথাকে ক্রমেই বেশি করে সমর্থন করেছে।

এইভাবে স্বতন্ত্র এক একটা জ্যোতিষ্ক যা তৈরি হল, সূর্য তথা তার গ্রহ ও উপগ্রহ— এই সবের মধ্যে প্রথমে পদার্থের যে গতিরূপটার প্রাধান্য থাকে তাকে আমরা বলি তাপ। সূর্যের মতো প্রচণ্ড উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ডে রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতির প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই অবস্থায় তাপ কীভাবে বিদ্যুৎ বা চৌম্বক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে তা ক্রমাগত সৌর পর্যবেক্ষণের পরই দেখা যাবে। এ কথা আজ প্রমাণিত বললেই চলে যে, সূর্যের মধ্যে যে যান্ত্রিক গতি আছে তার উদ্ভব একান্তই তাপের সঙ্গে অভিকর্ষের সংঘাত থেকে।

বস্তুপিণ্ডের ভর যত কম হয় তত দ্রুত তা শীতল হয়। উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ও উল্কাপিণ্ড প্রথম ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যেমন আমাদের চাঁদ বহু আগেই নির্বাপিত হয়েছে। গ্রহগুলি তুলনায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়। কেন্দ্রীয় বস্তুপিণ্ডটি সবচেয়ে ধীরে ঠাণ্ডা হয়।

ক্রমশ ঠাণ্ডা হওয়ার সাথে সাথে বস্তুর গতির বিভিন্ন রূপগুলির পারস্পরিক ক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটে এবং সেগুলি একে একে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। ক্রমে একটা পর্যায় আসে যখন রাসায়নিক আকর্ষণ দেখা দিতে থাকে, পূর্বের রাসায়নিকভাবে অভিন্ন উপাদানগুলি একের পর এক রাসায়নিকভাবে বিভিন্ন হয়ে উঠতে থাকে, রাসায়নিক ধর্ম অর্জন করে ও পরস্পর যৌগিক মিলনে বাঁধা পড়ে। তাপ ক্রমশ কমার সাথে সাথে রাসায়নিক যৌগগুলিরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। এই প্রক্রিয়া কেবল পৃথক পৃথক মৌলগুলিকেও প্রভাবিত করে তাই নয়, বিশেষ বিন্যাসে সংযোজিত মৌলগুলিকে প্রভাবিত করে। নতুন পরিস্থিতিতে গ্যাসীয় পদার্থের কিছু অংশ তরল ও পরে কঠিন আকার নেয় এবং এভাবে উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেও তা বদলায়।

একটা স্তরে এসে গ্রহের কঠিন বহিরাবরণ গড়ে ওঠে এবং উপরিতলে যখন জল সঞ্চিত হয় তখন কেন্দ্রীয় জ্যোতিষ্ক থেকে প্রাপ্ত তাপের তুলনায় বেশি হারে গ্রহের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ তাপ কমতে থাকে। তৈরি হয় এমন বায়ুমণ্ডল, যা আজ আমরা যাকে আবহাওয়া বিজ্ঞান বলি, তার আওতায় পড়ে। গ্রহের উপরিতল হয়ে ওঠে ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র, সেখানে ভূগর্ভের জ্বলন্ত তরলের ধীর ক্ষীয়মাণ বাহ্যিক ফলাফলের চেয়ে আবহমণ্ডলের অধঃক্ষেপজনিত স্তর ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য পেতে থাকে।

শেষ পর্যন্ত তাপমাত্রা যদি এমনভাবে সমান হয়ে আসে, যার দ্বারা গ্রহের উপরিতলের এক বড় অংশের তাপমাত্রা প্রোটিনের জীবনধারণের উপযুক্ত তাপের চেয়ে বেশি হয়ে যায় না, এমন অবস্থায় অন্যান্য রাসায়নিক পূর্বশর্তগুলি অনুকূল থাকলে জীবন্ত প্রোটোপ্লাজমের উদ্ভব হয়। এই পূর্বশর্তগুলি কী তা আমরা এখনও জানি না। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন এখনও পর্যন্ত জানা নেই। বিভিন্ন রাসায়নিক কাঠামো নিয়ে কত ধরনের প্রোটিন জাতীয় বস্তু আছে তাও আমাদের জানা নেই। মাত্র বছর দশেক আগে জানা গিয়েছে, পুরোপুরি গঠনহীন প্রোটিনও পরিপাক, রেচন, চলন, সংকোচন, উত্তেজনায় সাড়া দান ও পুনরুৎপাদনের মতো জীবনের মূল ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করে।

পরবর্তী অগ্রগতি ঘটতে এবং এই গঠনহীন প্রোটিন থেকে কেন্দ্র (নিউক্লিয়াস) ও ঝিল্লি (মেমব্রেন) গঠিত হয়ে প্রথম কোষ তৈরি হতে সম্ভবত হাজার হাজার বছর লেগেছে। এই প্রথম কোষই পরবর্তীকালের গোটা জৈবজগতের অঙ্গসংস্থানগত বিকাশের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। প্রত্নজীববিজ্ঞানের সংগৃহীত সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যেতে পারে, প্রথমেই বিকশিত হয়েছে কোষযুক্ত ও কোষহীন অসংখ্য প্রটিস্টার প্রজাতি, যার মধ্যে একমাত্র ইয়োজোন কানাডেন্স আজও টিকে আছে। এ থেকে একটা ধারা ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে আদি উদ্ভিদ হিসাবে ও অন্য ধারাটি আদি প্রাণী হিসাবে গড়ে ওঠে। আদি প্রাণী থেকে আরও নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথক হয়ে যায় প্রাণীর অসংখ্য শ্রেণি, বর্গ, পরিবার, প্রকার ও প্রজাতি। সর্বশেষে গড়ে ওঠে মেরুদণ্ডী প্রাণী, যার মধ্যে স্নায়ুতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায় এবং শেষত, এদের মধ্য থেকেই এসেছে সেই মেরুদণ্ডী প্রাণীটি যার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আত্মচেতনা লাভ করে, অর্থাৎ মানুষ।

মানুষের উদ্ভবও পৃথকীভবনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এবং সেটা শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, অর্থাৎ একটিমাত্র ডিম্বকোষ থেকে প্রকৃতিসৃষ্ট জটিলতম জীবসত্তা হিসাবে পৃথকীভূত হওয়া নয়, ইতিহাসগত হিসাবেও। হাজার হাজার বছরের সংগ্রামের পর যখন হাত আর পায়ের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা গেছে, তখনই মানুষ বানর থেকে স্বতন্ত্র হঠে উঠতে পারল এবং ভিত্তি রচিত হল পৃথকোচ্চারিত কথার ও মস্তিষ্কের সেই প্রবল বিকাশের যা সেই থেকে মানুষ ও বানরের মধ্যকার ব্যবধানকে একেবারে অনতিক্রম্য করে দিয়েছে। শুরু হল হাতের বিশেষ ব্যবহার, যার অর্থ হাতিয়ারের উদ্ভব এবং হাতিয়ারের অর্থ বৈশিষ্ট্যসূচক মানবিক ক্রিয়া, প্রকৃতির উপর মানুষের রূপান্তরকারী প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ উৎপাদন। সংকীর্ণতর অর্থে জীবজন্তুরও হাতিয়ার আছে, কিন্তু সেটা হল তাদের দেহেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেমন দেখা যায় পিঁপড়ে, মৌমাছি, বিভার প্রভৃতি প্রাণীর ক্ষেত্রে। জীবজন্তুরাও উৎপাদন করে, তবে চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রকৃতিতে তাদের উৎপাদনপ্রসূত প্রভাব প্রায় কিছুই নয়। একমাত্র মানুষই প্রকৃতির উপর নিজের ছাপ মেরে দিতে পেরেছে। শুধু উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আলাদা আলাদা প্রজাতিকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নয়, তার নিজের বাসস্থানের জলবায়ু এবং বাইরের চেহারাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে, এমনকি গাছপালা ও জীবজন্তুগুলিকেও এমনভাবে বদলে দিয়ে যে একমাত্র পৃথিবীটার সামগ্রিক নির্বাপণ ছাড়া মানুষের কার্যকলাপের এইসব ফলাফলের অবলুপ্তি কিছুতেই হবে না।

এই কাজটা মানুষ করেছে প্রধানত হাতের সাহায্যে। এমনকি প্রকৃতিকে বদলাবার জন্য মানুষের এখনও পর্যন্ত সবথেকে শক্তিশালী হাতিয়ার যে বাষ্পীয় এঞ্জিন তাও হাতিয়ার বলেই শেষ পর্যন্ত হাতের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু ধাপে ধাপে হাতের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ হল মস্তিষ্কেরও, দেখা দিল চেতনা, প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজনের ফলাফলগুলি সৃষ্টি করার অবস্থা সম্পর্কে চেতনা, তারপরে, তার ভিত্তিতে অধিকতর আনুকূল্যপ্রাপ্ত জাতিগুলির মধ্যে এল সেইসব প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি যা এই সব প্রয়োজনীয় ফলাফল নিশ্চিত করে দেয়। আর প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করবার উপায়ও বাড়তে লাগল। যদি হাতের সঙ্গে সঙ্গেই এবং অংশত হাতের ক্রিয়ার ফলেই মস্তিষ্কও বিকশিত না হত, তাহলে শুধুমাত্র হাতের সাহায্যেই বাষ্পীয় ইঞ্জিন কখনই তৈরি করা যেত না।

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পৌঁছেছি ইতিহাসের ক্ষেত্রে। জীবজন্তুরও ইতিহাস আছে, অর্থাৎ তাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের পথে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছানোর ইতিহাস। তবে এ ইতিহাস তাদের হয়ে অন্যের করে দেওয়া এবং তাদের জ্ঞান ও ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে এই ইতিহাস রচিত। অন্য দিকে মানুষ যতই অপরাপর প্রাণী থেকে বিশেষ অর্থে আলাদা হয়েছে, ততই তারা অনভিপ্রেত ফলাফল ও ইতিহাসের নিয়ন্ত্রক অজানা শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সচেতনভাবে নিজেরাই ইতিহাস গড়েছে। মানুষের পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের সঙ্গে ইতিহাসের ফলাফলটির মিলও ততই বেশি নিখুঁত হয়েছে। এই মাপকাঠিতে যদি আজকের সবচেয়ে শিল্পোন্নত জাতির ইতিহাসকে মাপি তাহলে দেখতে পাব, লক্ষ্যের সঙ্গে ফলাফলের দুস্তর ব্যবধান। দেখব যে, অজ্ঞাতপূর্ব ফলাফলের প্রভাবই বেশি এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চালু শক্তিগুলির চেয়ে অনিয়ন্ত্রিত শক্তিরই পরাক্রম অনেক বেশি। যতদিন মানুষের সবচেয়ে মূল ঐতিহাসিক কার্যকলাপ, অর্থাৎ যে কার্যকলাপের দ্বারা মানুষ জীবজন্তুর স্তর থেকে মানবিক স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং যা তার অন্যান্য সমস্ত কার্যের বৈষয়িক ভিত্তি, অর্থাৎ তার জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন, মানে আজকের দিনে সামাজিক উৎপাদন সেই অনিয়ন্ত্রিত শক্তির অবাঞ্ছিত ফলাফলেরই ঘাতপ্রতিঘাতের সবিশেষ অধীন হয়ে থাকছে এবং বেশিরভাগ সময়েই প্রত্যাশার ঠিক উল্টো হয়ে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাচ্ছে নিতান্ত ব্যতিক্রম হিসেবে, ততদিন তা না হয়ে পারে না। সর্বাধিক শিল্পোন্নত দেশে আমরা প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করে মানবকল্যাণে লাগাচ্ছি, এই প্রক্রিয়ায় আমরা উৎপাদন বহুগুণ বাড়িয়েছি। যার ফলে অতীতে একশো পূর্ণবয়স্ক মানুষ যা উৎপাদন করত আজ একটা শিশুও করে তার থেকে বেশি। কিন্তু কী তার ফল হয়েছে? অত্যধিক খাটুনি, ব্যাপক অংশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা বৃদ্ধি ও দশ বছর অন্তর চক্রাকারে অর্থনীতির মহাসংকট। যোগ্যতমের টিকে থাকার সংগ্রাম ও অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থনীতিবিদেরা যাকে সর্বোচ্চ ঐতিহাসিক কীর্তি বলে ঘোষণা করেন, সেটা যে জীবজগতেরই স্বাভাবিক অবস্থা এটা দেখানোর মধ্য দিয়ে ডারউইন মানবজাতির উদ্দেশে, বিশেষত তাঁর স্বদেশবাসীর উদ্দেশে কী তিক্ত ব্যঙ্গ করে গেলেন, তা তিনি জানতেন না। সাধারণভাবে উৎপাদন যেমন বাকি জীবজগৎ থেকে মানুষকে প্রজাতি হিসেবে উন্নীত করে দিয়েছে, ঠিক তেমনই সামাজিকভাবে মানুষকে অন্য জীবজগতের থেকে উন্নীত করতে পারে শুধু সামাজিক উৎপাদনের সচেতন সংগঠন— যার মধ্যে উৎপাদন ও বন্টন হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী। ইতিহাসের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই এইরকম সংগঠন আরও অপরিহার্যই শুধু নয়, সম্ভবপরও হয়ে উঠছে। সেই থেকেই ইতিহাসের এক নতুন যুগ শুরু হবে, যে যুগে মানুষের নিজের এবং তার সঙ্গে তার কার্যকলাপের সমস্ত শাখার, বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের এমন অগ্রগতি দেখা যাবে, যার সামনে আগেকার সমস্ত অগ্রগতি ম্লান হয়ে যাবে।

(চলবে)

পড়ুন
ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের
সমাজতন্ত্র ঃ কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক
একটি গণদাবী প্রকাশনা

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী
স্টল নং ৩৭৫

পদুয়ায় পার্টি অফিস উদ্বোধন

২৪ ডিসেম্বর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর ২ নং ব্লকের পদুয়া মোড়ে এসইউসিআই (সি)-র নতুন অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। জনসভার শুরুতে পলিটবুরো সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনানো হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার আলি নস্করও বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অজয় সাহা। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণকান্তি নস্কর।

ধর্মঘটের প্রচারে বিজেপির হামলা ত্রিপুরায়

৮ জানুয়ারির সারা ভারত ধর্মঘটের সমর্থনে এসইউসিআই(সি) কর্মীরা ত্রিপুরার উদয়পুরে। প্রচার চালাচ্ছিলেন গত ৫ জানুয়ারি। ডিএম অফিসের সামনে ক্ষমতাসীন বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী চড়াও হয় তাঁদের উপর। পোস্টার, কাগজপত্র ছিঁড়ে মারধর করে। মহিলা কর্মীরাও রেহাই পাননি। এসইউসিআই(সি)-র ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এই জঘন্য আক্রমণের তীব্র নিন্দা করে রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানিয়েছে প্রশাসনের কাছে।

মালদায় এনআরসি বিরোধী প্রচারে হামলা

২ জানুয়ারি মালদা জেলায় পাকুয়া বইমেলায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের এনআরসি বিরোধী প্রচারপত্র বিতরণে বাধা দেয় আরএসএস-এর দুষ্কৃতীরা। তারা এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের পাকিস্তানের দালাল বলে গালাগাল করতে থাকে এবং হ্যান্ডবিল ও বইপত্র জোর করে কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় এনআরসি ও সিএএ বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র বলিষ্ঠ বক্তব্য খণ্ডন করার কোনও যুক্তি আরএসএস-এর ভাণ্ডারে নেই। তাই পেশিশক্তির ব্যবহার। এস ইউ সি আই (সি)-র মালদা জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকার আরএসএস-বিজেপির ওই দুষ্কৃতীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। ৪ জানুয়ারি বইমেলা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে এই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি জানানো হয় এবং বামনগোলা থানায় উক্ত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ডায়েরি করা হয়।

ত্রিপুরায় দুধের দাম বাড়াল বিজেপি সরকার

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিবাদ

ত্রিপুরায় গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন ৭ জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন

প্রকারের প্যাকেটজাত দুধের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করেছে। বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ প্রায় ৩০ শতাংশ। ১৯৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ডেয়ারি অনেকবার দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করলেও এবারের বৃদ্ধি অতীতের রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে। শহর ও শহরতলির সাধারণ মানুষ গরুর দুধের অভাবে ডেয়ারির দুধ দিয়েই তাঁদের চাহিদা পূরণ করেন। এমনিতেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। এই অবস্থায় ডেয়ারির সকল প্রকার দুধের দাম বৃদ্ধি ঘটায় কর-দর-মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত সাধারণ মানুষের উপর বাড়তি বোঝা চাপলো। দুধের এই দাম বৃদ্ধির ফলে দুগ্ধজাত অন্যান্য জিনিসের দামও বাড়বে। গো-পালকদের যে সব সমস্যা দেখিয়ে গোমতী কর্তৃপক্ষ দুধের দাম বৃদ্ধি করেছে সে বিষয়গুলি রাজ্য সরকারেরও দেখার বিষয়। তাদের সমস্যাগুলি বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার সমাধান না করে দুধের দাম বৃদ্ধির দিকে ঠেলে দিল। এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গোমতী কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়নের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নিকট স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করেছে ডায়েরির দুধের বর্ধিত মূল্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে, দুগ্ধজাত অন্যান্য সামগ্রীর দামও বৃদ্ধি করা চলবে না। স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক, কমরেডস সুব্রত চক্রবর্তী, সঞ্জয় চৌধুরী, শিবানী ভৌমিক।

গার্মেন্ট শ্রমিকদের শ্রমদপ্তর অভিযান

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সহস্রাধিক পোশাক শ্রমিক তাদের পেশাগত বিভিন্ন দাবিতে ৯ জানুয়ারি খড়্গপুর শহরের কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড থেকে সুসজ্জিত মিছিল করে এসে জেলার শ্রমদপ্তর ডি এল সি-তে বিক্ষোভ দেখায়। গার্মেন্ট শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, সরকারি পরিচয়পত্র প্রদান, শ্রমিক পরিবারের

ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও সকলের জন্য চিকিৎসা, সবার জন্য সরকারি পেনশনের ব্যবস্থা, মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যের দাবি ওঠে মিছিল থেকে। নেতৃত্ব দেন সারা বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়ন-এর নেতা নন্দ পাত্র, গৌরীশঙ্কর দাস, পূর্ণ বেরা, বংশী মণ্ডল, শ্যামাপদ জানা, বৃন্দাবন মহাপাত্র, নিতাই পণ্ডিত, সুদাম কুণ্ডু, শঙ্কর মাঝি, নির্মলেন্দু খাটুয়া, সোমা জানা, আস্তারি বিবি প্রমুখ। ডি এল সি দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

মধ্যপ্রদেশে বেসরকারিকরণ বিরোধী সমাবেশ

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেচে দিচ্ছে। ২৯ ডিসেম্বর ইন্দোরে বেসরকারিকরণ বিরোধী জন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সন্তোষ সভাকক্ষে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত ছাত্র-যুবকদের ভিড়ে সভাকক্ষ উপচে পড়ে। বাইরে চেয়ার দিয়ে, পর্দা টাঙিয়ে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয় উদ্যোক্তাদের। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবী। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল আনন্দমোহন মাথুর। প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যাপক তরুণ কুমার। সম্মেলনে এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আইডিবিআই ব্যাঙ্কের কনট্রাকচুয়াল কর্মীদের জয়

নতুন ভেন্ডার (কনট্রাক্টর) আসার পর ১ নভেম্বর ২০১৮ থেকে আইডিবিআই ব্যাঙ্কের অফসাইট এ টি এমে সিকিউরিটি স্টাফদের বেতন ৩০০০-৪০০০ টাকা কমিয়ে দেয় এবং তাদের পদ সিকিউরিটি স্টাফ থেকে হাউসকিপিং স্টাফ করে দেওয়া হয়। অন্যান্য দল পরিচালিত প্রায় সমস্ত কনট্রাকচুয়াল ইউনিয়ন ভেন্ডারের এই অন্যায় পদক্ষেপ মেনে নিলেও ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম ও কনট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

এর প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি সহ শ্রম কমিশনার (সেন্ট্রাল)-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কমিশনার জানান, এভাবে বেতন কমানো যায় না। লাগাতার লড়াই আন্দোলনের ফলে ফোরামের দাবি মেনে নিয়ে ভেন্ডার ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে কমিয়ে দেওয়া বেতন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয় এবং ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে সিকিউরিটি স্টাফের সমবেতন দিতে রাজি হয়।

যুক্ত ফোরামের পক্ষ থেকে কমরেড জগন্নাথ রায় মণ্ডল এবং কমরেড নারায়ণ পোদ্দার আন্দোলনের পাশে থাকার জন্য কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মদের প্রসার অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি তুললেন মহিলারা

মদের নেশায় বিধ্বস্ত হচ্ছে পুরুলিয়া জেলার পরিবেশ। সর্বস্বান্ত হচ্ছে পরিবার। এর বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা। জঙ্গলমহল এলাকায় তাঁরা গড়ে তুলেছেন 'মদ বিরোধী আন্দোলন কমিটি'। ২ জানুয়ারি এই কমিটির বান্দোয়ান শাখার উদ্যোগে বিডিও দপ্তর অভিযান করা হয়। ব্যাপক সংখ্যায় সাধারণ মানুষ, বিশেষত মহিলারা সামিল হয়েছিলেন।

জাতীয় শিক্ষানীতি বেসরকারিকরণের পথ প্রশস্ত করবে সেভ এডুকেশন কমিটি

১২ জানুয়ারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ধী ভবনে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্মেলনে বিজেপি সরকারের খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস বলেন, 'এই শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার কেন্দ্রীয়করণ হবে, মার্কিনীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে, বেসরকারিকরণের উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে।' তিনি প্রশ্ন করেন, 'যেখানে অক্সফোর্ড, কেমব্রিজে সিবিসিএস নেই, বাৎসরিক পরীক্ষা আছে, সেখানে এদেশে সিবিসিএস কেন?' তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষার যে আন্তর্জাতিকীকরণ করা হচ্ছে, তার মাধ্যমে আমরা যেন আর এক সাম্রাজ্যবাদের শিকার না হই।' প্রসারভারতীর প্রাক্তন অধিকর্তা জহর সরকার বলেন, 'এই শিক্ষানীতি অত্যন্ত পরিকল্পিত আধিপত্যবাদী নীতি। বলেন, 'গোটা নীতিই স্ববিরোধিতায় ভরা। আমাদের উচিত বিপদের প্রতিটি দিক ধরে ধরে বিরোধিতা করা।' সহ উপাচার্য প্রদীপ ঘোষ বলেন, 'এই নীতিতে স্কুল শিক্ষা নিয়ে অনেক সমস্যার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সমাধানের কথা নেই। এই নীতির ফলে বেসরকারি স্কুল ব্যবস্থা প্রাধান্য পাবে।' প্রাক্তন উপাচার্য চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ' আমাদের উচিত বিকল্প শিক্ষানীতি সরকারের কাছে হাজির করা।' এছাড়া বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মীরাতুন নাহার, অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক অনীশ রায়, অধ্যাপক তরুণ নস্কর প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। সম্মেলনের মূল প্রস্তাব পাঠ করেন ডঃ মৃদুল দাস ও সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন কার্তিক সাহা। জেএনইউ, জামিয়া মিলিয়া সমেত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপর আক্রমণের নিন্দা করে প্রস্তাব পেশ করেন চঞ্চল ঘোষ।

অধ্যাপক চন্দ্রশেখর চক্রবর্তীকে সভাপতি ও অধ্যাপক তরুণ নস্করকে সম্পাদক করে ১৪৮ জনের নতুন রাজ্য সেভ এডুকেশন কমিটি গঠন হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী শ্রম নীতির প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি-র ডাকে ৮ জানুয়ারি সর্ব ভারতীয় বনধের সমর্থনে গুজরাটে বিক্ষোভ।

ইরানে মার্কিন হানাদারির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরাম

ইরানের মিলিটারি জেনারেল হত্যার নারকীয় ঘটনা সম্পর্কে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহ সভাপতি মানিক মুখার্জী ৭ জানুয়ারি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে বাগদাদ বিমানবন্দরে ইরানের সেনাবাহিনীর কম্যান্ডার কাসেম সুলেইমানের হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরাম। মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার জঘন্য দস্যুবৃত্তির এটা আর একটা নমুনা।

বাগদাদে একটি বিক্ষোভ মিছিল চলাকালীন ইরাকি মিলিশিয়া মার্কিন দূতাবাস এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই এই ঘটনার পিছনে ইরানের ষড়যন্ত্র কাজ করছে বলে প্রচার করতে থাকেন এবং ঘোষণা করেন, এর জন্য ইরানকে শাস্তি দেওয়া হবে। এর আগে আমেরিকা ইরানের উপর নির্মম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে এবং দীর্ঘদিন ধরেই সামরিক আক্রমণের হুমকি দিয়ে চলেছে। কারণ ইরান মার্কিন নির্দেশের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছে।

সাজানো অজুহাত তুলে কোনও সার্বভৌম দেশের উপর মার্কিন আগ্রাসনের এটাই একমাত্র ঘটনা নয়। আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি ইরাক এবং লিবিয়ার উপর মার্কিন আক্রমণ এবং ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন ও লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গদ্দাফির হত্যার ঘটনা। ইরানের মিলিটারি কম্যান্ডার হত্যার সাম্প্রতিক ঘটনা ওই দেশের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা এবং সাথে সাথে বিশ্বশান্তির পক্ষে মারাত্মক বিপদের সঙ্কেত। আমরা বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে এই মার্কিন হানাদারির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুদ্ধচক্রান্ত বন্ধ করতে বাধ্য করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শিক্ষার দাবিতে বেলদায় সভা

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ বাতিল, ২০২০ শিক্ষাবর্ষেই প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার দাবিতে ৬ জানুয়ারি অবস্থান ও সভা অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদাতে। অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকীতে বেলদা গান্ধী পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সভায় বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি, পাশ-ফেলের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রধান আলোচক ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর। বিদ্যাসাগরের জীবনের নানা ঘটনাবলি সহ বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তার বিষয়ে আলোকপাত করেন তিনি। এদিনের অবস্থান ও সভায় উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বিভূতি দে, অধ্যাপক বাসুদেব ধাড়া, শিক্ষক সূর্যকান্তি নন্দ, দীপককুমার গিরি, কবি পরেশ বেরা, অনন্ত জানা সহ অনেকে।

সরকার অবৈতনিক শিক্ষা দেবে না কেন?

বহুদিন পর ভারতে বর্তমান ছাত্র আন্দোলন সকলের সমীহ অর্জন করেছে। দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্বাভাবিক ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে আন্দোলন শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নয়, শাসক বিজেপি সরকারের বুকে কাঁপন ধরিয়েছে। পাশাপাশি আমজনতার মধ্যে আশা জাগিয়েছে। অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে। ঠিক একই সময়ে বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন লক্ষণীয় উচ্চতায় পৌঁছেছে। এই আন্দোলন দমনে বিজেপি সরকারের বর্বর আক্রমণ সারা দেশে নিন্দা কুড়িয়েছে। মানুষকে আরও বেশি আন্দোলন মুখর করেছে। জে এন ইউতে রাতে আলো নিভিয়ে দিয়ে বিজেপি সরকারের পুলিশ এবং আরএসএস-এবিভিপি দুষ্কৃতীদের ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত নিন্দা-ঘৃণা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

কিন্তু হঠাৎ ছাত্রসমাজ সরকার-বিরোধী জেহাদ ঘোষণা করেছে কেন? এই আন্দোলন আকস্মিকভাবে ফেটে পড়লেও বাস্তবে বিক্ষোভটা জমেছে দীর্ঘদিন ধরেই। এর মধ্যে ফি-বৃদ্ধি এবং সিএএ প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের একের পর এক জনবিরোধী নীতি, বিশেষ করে শিক্ষায় গৈরিকীকরণ, ইতিহাস বিকৃতি, বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণাকে কুসংস্কার বা অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা নস্যাৎ করা ইত্যাদি ছাত্র সমাজকে ক্রমাগত ভাবিয়ে তুলেছিল যে, বর্তমান সরকারের হাতে দেশের সমাজের ভবিষ্যৎ বিপন্ন। ফলে ক্ষোভের আগুন ধিকিধিকি করে জ্বলছিলই। ফি বৃদ্ধি এই আগুনে হাওয়া দিয়েছে।

ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ডেটাবেসের তথ্য বলছে, ভারতে অর্ধেক ছাত্রছাত্রীই 'ড্রপআউট' হন অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য। ছাত্রদের পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরে তথ্য দেখিয়েছে, ৯০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের মাসে উপার্জন ১২ হাজার টাকার কম। এর মধ্যে ৫০ শতাংশেরই মাসিক উপার্জন ৫ হাজার টাকার কম। স্বাভাবিকভাবেই এই সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা পারিবারিক উপার্জনের ভিত্তিতে ব্যয়বহুল উচ্চশিক্ষা বা প্রযুক্তিগত শিক্ষায় যেতে পারে না।

এ রাজ্যের মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা, মাধ্যমিক স্তরেই একজন ছাত্রকে প্রাইভেট কোচিং-এর জন্য বছরে ন্যূনতম ৩০-৪০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ব্যয় আরও বেশি। ফলে শিক্ষা ঋণ ছাড়া বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী এখন উচ্চশিক্ষায় যেতে পারে না। তা ছাড়া এত বিপুল খরচ করে শিক্ষার পর চাকরি হবে কি না, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই প্রেক্ষাপটে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিক্ষোভ জন্ম নেওয়া খুবই স্বাভাবিক।

জে এন ইউতে ফি-বৃদ্ধি নিয়ে কর্তৃপক্ষের অনড় অবস্থানই ছাত্র আন্দোলনকে দীর্ঘায়িত করে চলেছে। কর্তৃপক্ষের অনড় অবস্থানের পিছনে রয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ভূমিকা। ১৯৮৬ সালে কংগ্রেসের রাজীব গান্ধীর সরকারের নেতৃত্বে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষাকে অনন্য লাভজনক ব্যবসা হিসাবে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি এনেছিল, বর্তমান বিজেপি সরকার সেই পথ ধরেই হেঁটে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে আরও বেশি করে মুনাফা লুটের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। এদের দৃষ্টিতে ছাত্র হল ক্রেতা। আর শিক্ষা মানে বিক্রয়যোগ্য পণ্য। সরকার ছাত্রদের দেশের সম্পদ ভাবতে পারে না। তাদের দক্ষ করে তোলার জন্য অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়ার কথা এদের ভাবনায় নেই। ছাত্ররা যে ক্রমাগত সরকার বিরোধী হয়ে উঠছে তার শিকড় এখানেই নিহিত।

জে এন ইউ কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের কথা শুনতেই চাইছেন না। তারা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরছেন তাদের সমস্যার কথা। ৯ জানুয়ারি কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে গবেষকদের ডাকা এক সভায় জেএনইউ-র ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড লেবার স্টাডিজের ছাত্রী কৃতী ভগত জানালেন, "আমার বাবার কোনও পাকা চাকরি নেই। জে এন ইউয়ে ফি খুব কম। তাই পড়াশোনা চালাতে পারছি। ফি বাড়লে আর পারব না"(আনন্দবাজার পত্রিকা-১০.১.২০২০)।

এই সমস্যা দেশের সিংহভাগ মানুষের। সরকার এই সমস্যা সমাধান না করলে আন্দোলন বারবার ফেটে পড়বেই।

প্রয়োজন বামপন্থী নেতৃত্ব

একের পাতার পর

দুরবস্থা থেকে মানুষের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে এবং সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে বিপথগামী করতে শাসক আরএসএস-বিজেপি ধর্ম-বর্ণ-জাতকে ভিত্তি করে তাদের বিভক্ত করার ধূর্ততা ক্রমাগত চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্য থেকে যখন তারা এনআরসি নিয়ে এল, তা আপামর জনগণের মধে নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলল। এবার আতঙ্কিত হল শাসক শ্রেণি। আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিভাজন তৈরি করে আন্দোলনকে ভাঙতে তারা মুসলমান ছাড়া বাকি শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার নাম করে নিয়ে এল সিএএ।

কিন্তু শাসক শ্রেণির ছল মানুষ ধরে ফেলল। কোনও রাজনৈতিক দলের অপেক্ষা না রেখে ছাত্ররা ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনে। প্রবল ঠাণ্ডা তুচ্ছ করে সন্তান কোলে মায়েরা নেমে এলেন রাস্তায়। এই আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ছাত্র-যুবদের অংশগ্রহণ। বিশেষত মেয়েরা এই আন্দোলনে যে সাহস দেখাল তা খুবই প্রেরণাদায়ী। ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবী-বিজ্ঞানী-ইতিহাসবিদ-চিকিৎসক-লেখক-সাংবাদিক-শিল্পী-আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাতিমানরাও শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে যোগ দিলেন শ্রমিক-চাষি সহ সব ধরনের মানুষের গড়ে ওঠা এই আন্দোলনে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ছাত্রী কনভোকেশনের মঞ্চে সিএএ-র কপি ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানালেন। দিল্লির শাহিনবাগের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল দেশজুড়ে। কলকাতায় প্রথমে পার্কসার্কাসে, পরে জ্যাকারিয়া স্ট্রিটে একই রকমের আন্দোলন জনগণের অংশগ্রহণে মানুষের মনে প্রবল নাড়া দিল।

এই আন্দোলন প্রমাণ করে দিল যে দেশের মানুষ নীরবে বিজেপির প্রতারণা, বিভ্রান্তির রাজনীতি মেনে নেবে না। সমস্ত রকমের অবৈজ্ঞানিক, অযৌক্তিক চিন্তার প্রসারকেও যে তারা মানবে না, তা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ঘোষণা করল। স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপি সরকার এবং শাসক শ্রেণি আন্দোলন দমন করতে আন্দোলনকারীদের উপর তাদের হিংস্র দাঁত-নখ প্রয়োগ করতে দ্বিধা করল না। আলিগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে, জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে শাসকেরা ছাত্রদের উপর বীভৎস অত্যাচার নামিয়ে আনল।

পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন ব্যাপক রূপ নিল। প্রধানমন্ত্রী বললেন, তিনি পোশাক দেখেই বুঝতে পারছেন আন্দোলন কারা করছে। আন্দোলনে তিনি সাম্প্রদায়িক রঙ চাপানোর চেষ্টা করলেন। অমনি হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীরা মুসলমান পোশাক পরে আর মুসলমান ছাত্র-ছাত্রছাত্রীরা হিন্দু পোশাক পরে আন্দোলনে আসতে থাকল। আন্দোলনে ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দায় যখন শাসকরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তখন দেখা গেল এক দল বিজেপি কর্মী লুঙ্গি এবং টুপি পরে ট্রেনে ঢিল ছুঁড়ছে। স্থানীয় মানুষ আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার এই চক্রান্ত ধরে ফেলল।

এই আন্দোলনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, আরএসএস-বিজেপি এবং তাদের সরকারের আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরির সব রকমের চেষ্টা সত্ত্বেও আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমানের তথা নানা ধর্ম-বর্ণের শোষিত মানুষের ঐক্যের অটুট ছবি। মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে। সাধারণ মানুষ যখনই জীবনের সাধারণ দাবিগুলি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নামে তখনই সংহতি এবং সৌভ্রাতৃত্ব লোহ-দৃঢ় হয়ে ওঠে। ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, জাত্যাভিমান, জাতিবাদী মানসিকতা— যেগুলি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকরা আন্দোলনে বিভাজন আনতে ছড়িয়ে দেয়, সেগুলি থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে।

এর জন্য প্রয়োজন জনগণের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হওয়া, ঠিক-ভুল ধরতে পারার ক্ষমতা অর্জন করা, উচিত-অনুচিত ধরতে পারা, ছদ্মবেশী শত্রুকে চিনতে পারা এবং আন্দোলনকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সঠিক রাস্তায় সংগ্রাম গড়ে তোলা। এই জন্যই গণআন্দোলনকে সুসংহত, সুশৃঙ্খল এবং সঠিক নেতৃত্বে গড়ে তোলার বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা শুধু সফলতার জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, সংগ্রামী জনতার কাঙ্খিত রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার জন্যও প্রয়োজনীয়। কিন্তু তা হল না। ফলে আন্দোলন বাস্তবে দিশাহীনই রয়ে গেল।

আন্দোলন যখন গতি পেল অমনি ভোটবাজ বুর্জোয়া-পেটি বুর্জোয়া দলগুলি এর থেকে ফয়দা তুলতে মৌমাছির মতো ঘুরঘুর করতে শুরু করে দিল। কংগ্রেস, শাসক একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত দল, এতদিন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে। ক্ষমতায় থাকার সময়ে একের পর এক জনবিরোধী নীতি নিয়েছে, শ্রেণি সংগ্রাম এবং গণআন্দোলনকে নির্মম ভাবে দমন করেছে, গণআন্দোলনের শত শত কর্মীকে হত্যা করেছে, নরম হিন্দুত্বের নামে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেছে এবং অজস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছে। একই ভাবে জরুরি অবস্থা জারি করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে। একই রকম ভাবে বিচার ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করার চেষ্টা চালিয়েছে এবং একের পর এক কালা কানুন জারি করেছে। কংগ্রেস রাজত্বেও অসংখ্য বড় বড় দুর্নীতি এবং কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটেছে। ফলে কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই কংগ্রেসই এখন গণতন্ত্রের, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে, উত্তাল গণআন্দোলনের পক্ষে সহানুভূতি জানাচ্ছে। ফলে এ কথা কোনও ভাবেই ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারতের শোষণমূলক পুঁজিবাদের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয়েই ফ্যাসিবাদ কায়েমের শক্তি। বাস্তবিক, আজ যে দলই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে চলবে তার চরিত্র ফ্যাসিবাদী হতে বাধ্য। উল্লেখ্য, গত শতকের চারের দশকের শুরুতে যখন সিপিআই সহ সব রাজনৈতিক দলগুলিই মনে করছিল ভারতে ফ্যাসিবাদ আসবে না, তখন আমাদের দলের নেতা, শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক, এ যুগের অন্যতম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদী চিন্তাপদ্ধতিতে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছিলেন, সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশে ফ্যাসিবাদ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। আরও ব্যাখ্যা করে তিনি দেখান, ভারতে ফ্যাসিবাদ রয়েছে বিশ্বাসের তত্ত্বে, 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর' এমন আপ্তবাক্যে, যার দ্বারা মানুষের মনকে যুক্তিবিচারের বিজ্ঞানসম্মত পথ থেকে সরিয়ে অন্ধ বিশ্বাস, পূর্বধারণা আর রহস্যবাদের কানাগলিতে ঠেলে দেওয়া হয়। শ্রেণিসংগ্রাম ও সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের বিরুদ্ধে জনমনকে বিষিয়ে তুলতে উগ্র জাতিবাদের স্লোগান তুলেছে এবং একই সঙ্গে দমন নীতি ও ভুল বোঝানোর দুমুখো রাস্তা নিয়েছে। ফ্যাসিজম সম্পর্কে বলতে গিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, গুটিকয়েক পুঁজিপতির হাতে ক্রমাগত বেশি বেশি পুঁজির কেন্দ্রীভবন ফ্যাসিবাদেরই চরিত্র-লক্ষণ। বলেছিলেন, ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি হল অধ্যাত্মবাদ এবং বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের অদ্ভুত মিশ্রণ। তাঁর এই বিশ্লেষণ আজ ভবিষ্যৎবাণীর মতো শোনাচ্ছে।

তৃণমূলের মতো আঞ্চলিক নানা দলও এই সময়ে মিটিং-মিছিল করতে নেমে পড়েছে এবং পুঁজিবাদী মিডিয়ার ব্যাপক প্রচার কুড়িয়ে চ্যাম্পিয়ান সাজতে চাইছে। অথচ ক্ষমতায় থেকে এই দলগুলিই কি পুঁজিবাদী নীতিগুলিকে কার্যকর করছে না এবং সব রকমের গণআন্দোলনকে দমন করছে না? জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার কোনও প্রচেষ্টা কি এই দলগুলির আছে? নাকি এই দলগুলি সবাই আন্দোলনে আছে এটা দেখিয়ে পরের ভোটে জিততে চাইছে? শেষ পর্যন্ত ভোটের বাক্সে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আন্দোলনের আর কোনও উদ্দেশ্য তাদের আছে কি? বাস্তবিক, ছাত্র-যুবরা, সাধারণ মানুষ যখন এই আন্দোলনে রক্ত ঝরাচ্ছে, বুলেটের সামনে বুক পেতে দিচ্ছে, মৃত্যুবরণ করছে, তখন ভোটবাজ এই দলগুলি এই আত্মদান থেকে নির্বাচনে কতখানি ফয়দা তোলা যাবে তার হিসেব কষছে।

বাস্তবিক এ এক কঠিন পরিস্থিতি। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে সব স্তরের শোষিত মানুষকে জড়িত করে সঠিক বামপন্থী লাইন এবং সঠিক বামপন্থী নেতৃত্বে শক্তিশালী সংগঠিত গণআন্দোলনের অনুপস্থিতিতে ফ্যাসিবাদী শক্তি মাথা তুলছে। ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী বাম-গণতান্ত্রিক গণআন্দোলন এই মুহূর্তের জরুরি প্রয়োজন। এই লক্ষ্য থেকেই, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত আমাদের দল বার সিপিএম-সিপিআইয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছে যাতে ভোটকেন্দ্রিক বুর্জোয়া রাজনীতির বিকল্প হিসাবে সংগ্রামী বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ এক বাম-বিকল্প জনগণের সামনে উপস্থিত করা যায়। কিন্তু তারা আমাদের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেনি। এবারও আমরা বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলে এই উত্তাল গণআন্দোলনকে বামপন্থী আন্দোলনের রূপ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলাম, যাতে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি দলগুলিকে এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় এবং আন্দোলনকে উন্নত বামপন্থী নীতি এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগঠিত সংগ্রামী রূপ দিয়ে দাবি আদায়ের জায়গায় যাওয়া যায়। এই লক্ষ্য থেকেই আমরা চলমান এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনে আরও সাতটি দাবি যোগ করেছিলাম।

কিন্তু তাঁরা আমাদের আবেদনে সাড়া দেননি। বরং সিপিএম নেতৃত্ব আমাদের এড়িয়ে চলছেন। একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি না হওয়া সত্ত্বেও অবিভক্ত সিপিআই গত শতকের ছয়ের দশকে পশ্চিমবাংলায়, কেরলে, অন্ধ্রপ্রদেশে এবং আরও কয়েকটি রাজ্যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছিল। কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতায় গিয়ে তারা সংগ্রামের পথ ত্যাগ করে। তারপর থেকে তারা আর কোনও শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলেনি শুধু নয়, এমনকি গড়ে ওঠা গণআন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণ করতে এবং তাতে নেতৃত্ব দিতেই অস্বীকার করেছে। তারা এখন শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির বিশ্বস্ত দল কংগ্রেসের সঙ্গে এবং রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলির বুর্জোয়া দলগুলির সঙ্গে জোট গড়ে তুলছে যাতে নির্বাচনে কিছু আসন জোগাড় করা যায়। বামপন্থার নামে যে রাজনীতির তারা আজ চর্চা করছে তা বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার, যা এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন, তার থেকে বহু দূরে। পরিবর্তে তারা বিরোধী সব দলগুলির সঙ্গে এমন জোট গড়ে তুলছে যার লক্ষ্য বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে কিছু আসন জোগাড় করা। আমাদের সঙ্গে জোট ভেঙে দেওয়া এবং যুক্ত আন্দোলনে না আসার এটাই কারণ।

এখানে উল্লেখ করা দরকার, জেপি আন্দোলন, যা এক সময় কংগ্রেসের দুর্নীতি, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি, স্বৈরাচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে ছাত্ররাই গড়ে তুলেছিল, যা একটা বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই আন্দোলনে আমরা সিপিএম এবং সিপিআইকে যুক্ত হওয়ার এবং আন্দোলনে বাম নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছিলাম যাতে আন্দোলন থেকে দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া দলগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কিন্তু সেই আহ্বান ব্যর্থ হয়েছিল। সিপিআই সেদিন সরাসরি কংগ্রেস জোটে যুক্ত হয়েছিল, আর সিপিএম তলায় তলায় ইন্দিরা সরকারের সাথে বোঝাপড়া গড়ে তুলেছিল। তারা অজুহাত তুলেছিল, যেহেতু এই আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক জনসংঘের মতো (বর্তমানে বিজেপি) অতি দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি রয়েছে তাই জনগণের ন্যায্য দাবিতে গড়ে উঠলেও তারা এই আন্দোলনে যোগ দেবে না। আর এই সুযোগে আন্দোলনের নেতৃত্বের দখল নিয়েছিল দক্ষিণপন্থীরা এবং আন্দোলনের কৃতিত্বকে আত্মসাৎ করে '৭৭ সালে ক্ষমতায় বসেছিল। এই সিপিএম নেতারা যখন দেখলেন, পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে দক্ষিণপন্থী জনতা দল, যা জনসংঘকে নিয়েই গড়ে উঠেছে, তা ক্ষমতায় বসতে চলেছে, তখন তারা পুরো একটা ডিগবাজি খেয়ে কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে সেই জনতা দলে গিয়ে ঢুকলেন। তাদের এই সুবিধাবাদী রাজনীতিই বিজেপিকে সামনে আসার এবং বুর্জোয়া রাজনীতিতে একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হওয়ার সুযোগ করে দিল। এই ভাবে সেদিন একিট সত্যিকারের সংগ্রামী বাম বিকল্প গড়ে তোলার এক কার্যকরী সুযোগ হাতছাড়া হল।

আজ আবার এনআরসি-সিএএ বিরোধী দেশজোড়া আন্দোলনে যুক্ত বামপন্থী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার তেমনই একটি সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। উত্তাল আন্দোলন দেখিয়ে দিচ্ছে জনগণের মধ্যে আন্দোলনের মানসিকতা প্রবল। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কাঙ্খিত বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তোলা যায় এবং দেশজোড়া শ্রেণি সংগ্রাম এবং গণআন্দোলকে তীব্র রূপ দেওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায়ও সিপিএম সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি কোনও আগ্রহই দেখাচ্ছে না। পরিবর্তে জনগণের কাছে ঘৃণিত কংগ্রেসের এবং আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির লেজুড়বৃত্তিতেই তার আগ্রহ বেশি। উল্লেখ্য, এই সিপিএম আসামে এনআরসি সমর্থন করেছে। এই অবস্থায় সিপিএম সিপিআইয়ের আপসকামী রাজনীতির বিরুদ্ধে আমাদের দল পূর্ণ শক্তি নিয়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং জনগণের কমিটি গড়ে তুলে সাহসী যুবকদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে আন্দোলনের মধ্যে জনগণের শক্তির জন্ম দেওয়ার এবং কাঙ্খিত সংগ্রামী বামপন্থী আন্দোলনে পরিণত করার সমস্ত রকম চেষ্টা করছে। কোনও রকম মিডিয়া প্রচার ছাড়াই রাজ্যে রাজ্যে মানুষ আমদের সংগ্রামী চরিত্রের কথা জানে। আমরা শ্রেণি সংগ্রাম এবং গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমরা পুনরায় সিপিআইএম নেতৃত্ব সহ তাদের সমর্থকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি সুবিধেবাদী ভোট রাজনীতি ত্যাগ করে বর্তমান এনআরসি-সিএএ বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ বিকল্প বাম বিকল্প গড়ে তুলতে এবং সেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে আন্দোলনকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে তাঁরা সময়ের আহ্বানে সাড়া দিন এবং তাঁদের রাজনৈতিক সততার পরিচয় দিন।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২৫)

পরিবারের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি

গোটা মানবসমাজটাই ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিবার। কোনও কারণে ব্যক্তিবিশেষকে তিনি কখনও পৃথক করে দেখতে চাননি। ব্যক্তিকে দেখার ক্ষেত্রে, নবজাগরণের মূল্যবোধ অনুসারে, চারিত্রিক গুণাবলীকেই তিনি একমাত্র মাপকাঠি ধরে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চলবার আন্তরিক প্রচেষ্টা করে গিয়েছেন। জন্ম এবং বৈবাহিক সূত্রে পারিবারিক সদস্যদের সাথে তাঁর আদানপ্রদান সেই দৃষ্টান্তমূলক ইতিহাসকেই আরও সুদৃঢ় এবং শিক্ষণীয় ভাবে প্রকাশ করে।

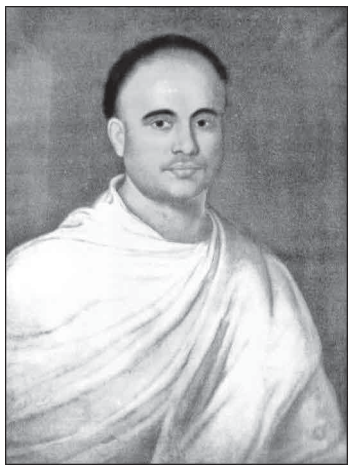

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, বাবা-মা'কে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, 'আমি কাশী মানি না, বিশ্বেশ্বর মানি না। আমি মা'কে মানি, বাবাকে মানি। আমার বাবা-ই আমার বিশ্বেশ্বর, আমার মা-ই আমার অন্নপূর্ণা।' কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখা দরকার, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভগবতী দেবী-কে নিছক বাবা-মা হিসেবেই বিদ্যাসাগর শ্রদ্ধা করতেন না। বাস্তবে এঁরা দুজনেই ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ এবং দরদী হৃদয়ের ব্যক্তিত্ব। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম করে ঠাকুরদাস বিদ্যাসাগরকে সেযুগের সর্বোচ্চ লেখাপড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই প্রবল কষ্ট তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সচ্ছলতার উদ্দেশ্যে নয়। কলকাতা শহর থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জন করে গ্রামে গিয়ে স্কুল খুলে বিদ্যাসাগর শিক্ষার প্রসার ঘটাবে, এই ছিল ঠাকুরদাসের অন্যতম লক্ষ্য। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তিনি বিদ্যাসাগরের প্রতি, বিশেষত তাঁর পড়াশুনার প্রতি সদা সতর্ক থাকতেন, কড়া নজর রাখতেন। তাঁর সারাদিনের আচার-আচরণে বা নির্দিষ্ট কোনও কাজে এতটুকু অবহেলা দেখলে ঠাকুরদাস তাঁকে নির্মমভাবে বকাঝকা এমনকি বেধড়ক মারধরও করতেন। অনেক সময় প্রতিবেশীরা ছুটে এসেও ঠাকুরদাসকে নিরস্ত করতে পারতেন না।

আশ্চর্য ভাবে, এহেন কড়া শাসনের পরেও বিদ্যাসাগর যত বড় হয়েছেন, বাবার প্রতি শ্রদ্ধা ততই তাঁর বেড়েছে। সচরাচর বাবার মত না নিয়ে কাজ করেননি বিদ্যাসাগর। আবার, শ্রদ্ধা করতেন বলে প্রয়োজনে বাবার সাথে দ্বিমত হতেও পিছপা হননি। বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র ও এক ভাই ঈশানচন্দ্রকে ঠাকুরদাস স্নেহান্ধভাবে প্রশ্রয় দিয়ে ঠিক করছেন না, এতে তাদের ক্ষতি হচ্ছে— একথা যখন বিদ্যাসাগরের মনে হয়েছে তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা লিখে চিঠি দিয়েছেন ঠাকুরদাসকে।

মা ভগবতী দেবী ছিলেন বিদ্যাসাগরের জীবন্ত প্রেরণাস্বরূপ। তাঁর প্রতি বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। কিন্তু সে কি নিছক তিনি তাঁর মা বলে? একেবারেই তা নয়। বিদ্যাসাগর-চরিত লিখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভগবতী দেবীকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় ভগবতী দেবী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একাধিক বিমুগ্ধ উচ্চারণ এক অসাধারণ স্বীকৃতি। তিনি লিখেছেন, "দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না।" কার্যত, ভগবতী দেবী ছিলেন অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, নির্ভীক, উদার এক ব্যক্তিত্ব। দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালবাসা-দয়া-মায়া প্রভৃতি অনেক গুণই ভগবতী দেবীর প্রভাবেই বিদ্যাসাগর-চরিত্রে সঞ্চারিত হয়েছে। বহুল প্রচলিত হলেও, ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গক্রমে দু-একটি ঘটনা স্মরণ করা যাক।

এক দুপুরে তিনি দেখলেন তাঁর ছোট্ট ছেলে ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালা থেকে ফিরেছে অন্য কারও একটা ছেঁড়া ময়লা জামা গায়ে দিয়ে। ভগবতী দেবী ভাবলেন, 'কী ব্যাপার? ছেলে তো পরে গিয়েছিল ভাল একটা জামা!' তিনি খোঁজ নিলেন। জানা গেল, বন্ধুর গায়ে ছেঁড়া জামা দেখে বিদ্যাসাগর নিজের জামা খুলে দিয়ে দিয়েছে তাকে। আর তার জামাটি গায়ে ফেলে বাড়ি ফিরে এসেছে। শোনা মাত্রই ভগবতী দেবী ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'খুব ভাল করেছিস বাবা, খুব ভাল করেছিস।'

একবার শীতকালে মায়ের গায়ে ছেঁড়া চাদর দেখে বিদ্যাসাগরের খারাপ লেগেছিল। টাকাপয়সা যোগাড় করে বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে কয়েকটা গরম জামাকাপড় কিনে গ্রামের বাড়িতে পাঠালেন। কয়েকদিন পর ভগবতী দেবী ছেলেকে জানালেন, বাবা, পারলে এইরকম গরম কাপড় আরও কিছু পাঠিও। বিদ্যাসাগর একটু কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। তিনি শুনলেন, আগের কাপড়গুলি আশপাশে যাদের গরম কাপড় নেই তাদের দিয়ে দিয়েছেন ভগবতী দেবী। কিন্তু এখনও কয়েকজন বাকি আছে। মা'র মুখটা মনে করে বিদ্যাসাগরের দু চোখের পাতা ভিজে গেল। পরদিনই আরও কিছু গরম কাপড় কিনে গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

একবার হ্যারিসন সাহেব বিলেতে ফিরে যাওয়ার আগে বিদ্যাসাগরের গ্রামের বাড়িতে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর একটু কিন্তু-কিন্তু করেও মা'কে সব জানালেন। মা তৎক্ষণাৎ সাহেবকে নিমন্ত্রণ করতে বলে দিলেন। বিদ্যাসাগর খুশি হলেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা বলাবলি শুরু করল, 'ইংরেজ সাহেব! মানে ম্লেচ্ছ ঢুকবে বামুনের বাড়িতে খেতে? বামুনের জাত যাবে যে!' ভগবতী দেবী এসব সংকীর্ণতায় কোনও তোয়াক্কা করার মানুষ ছিলেন না এবং যথারীতি সেসব করলেনও না। নির্দিষ্ট দিনে হ্যারিসন সাহেব এলেন বীরসিংহ গ্রামে। ভগবতী দেবীকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর বিদ্যাসাগরের সাথে মাটিতে বসেই তিনি ভগবতী দেবীর রান্না চেয়েচিন্তে তৃপ্তি করে খেলেন।

একবার, অনেকদিন মা'কে কিছু দেননি বিদ্যাসাগর। কথাটা মনে হতেই মা'কে বললেন, 'তোমার কী চাই বল মা।' ভগবতী দেবী গম্ভীরভাবে বললেন, আমার তিনটি দামি গয়না চাই। বিদ্যাসাগর একটু অবাক হলেন, মা দামি গয়না চাইছে? তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী গয়না চাই, মা?' ছেলের করুণ দশা দেখে হাসি চাপতে পারলেন না ভগবতী দেবী। তিনি বললেন, 'অবৈতনিক স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় আর অন্নসত্র— গ্রামে এই তিনটি জিনিস আমার চাই।' মায়ের হাসির আলোয় বিদ্যাসাগরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বিধবাবিবাহ আন্দোলনের জন্য কেবল বিদ্যাসাগরকে নয়, চরম হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল তাঁর বাবা-মা'কেও। প্রতিদিন তাঁদের গ্রামের বাড়ির সামনে দুনিয়ার জঞ্জাল ফেলে যেত রক্ষণশীল গোষ্ঠীর ভাড়াটে দুষ্কৃতীরা। অথচ পুলিশ তাদের নামধাম চাইলে ঠাকুরদাস কিছুই বললেন না। তবু পুলিশ তথ্য যোগাড় করে তাদের ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। গ্রামের লোক পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হবে দেখে ভগবতী দেবীর মন কেঁদে উঠল। তিনি ওই সব লোকগুলির বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এলেন, যাতে পুলিশ মনে করে এরা দোষী নয়। লোকগুলিও হাজতবাস থেকে বাঁচতে ভগবতী দেবীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলে এলেন এবং ভোজ খেয়ে গেলেন। তারপর আর উৎপাত করেনি তারা।

বিদ্যাসাগর যখন সবেমাত্র বিধবাবিবাহ আন্দোলন শুরু করছেন, তখন কোনো একসময় তাঁর মনে হয়েছিল, বিরোধীদের সাথে লড়ে জেতা যাবে না। তখন ভগবতী দেবী বলেছিলেন, "একবার যখন কাজ শুরু করেছ, তখন সমাজকর্তাদের ভয়ে পিছিয়ে এসো না। উপায় একটা বেরোবেই। আমি প্রসন্নমনে আশীর্বাদ করিতেছি। আহা! জনমদুঃখিনীদের যদি কোনো গতি করিতে পারো, তাহা এখনই কর বাবা।" লেখা বাহুল্য, এরপর বাকি ইতিহাসটা বিদ্যাসাগর ঠিকঠাকই লিখে দিয়েছেন।

নিজের জন্য চিন্তা না করে বিদ্যাসাগর অন্যের বিপদে যেমন সবসময় উদারভাবে সাহায্য করতেন, নিজের ভাই-আত্মীয়দেরও সেভাবে সাহায্য করেছেন। একইভাবে, কারও অন্যায় আচরণ দেখলে যেমন তার যথোচিত জবাব দিয়েছেন, আত্মীয়স্বজনদের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। এজন্য দুই ভাইয়ের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতিও ঘটেছিল, কিন্তু ভাই বলে বিদ্যাসাগর কোনও আপস করেননি। তাঁর একমাত্র ছেলে নারায়ণ যখন স্বেচ্ছায় বিধবাবিবাহ করতে এগিয়ে এসেছিল, তখন বিদ্যাসাগর খুশি হয়ে ছেলেকে সমর্থন ও সাহায্য করেছেন। আবার, সেই ছেলে যখন বিপথে গিয়েছে, বিবাহিতা স্ত্রীকে অপমান করেছে, বিদ্যাসাগর তখন একমাত্র ছেলেকেও ত্যাগ করেছেন, উত্তরাধিকারী হিসাবেও তাকে মনোনীত করেননি। এ নিয়ে স্ত্রী দিনময়ী বিদ্যাসাগরের প্রতি অভিমান করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর আপস করেননি। দিনময়ীকে তিনি সম্মান করতেন। অসংখ্য কাজের মাঝে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মতো তাঁকেও পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেননি বলে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "...বিনয়বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যদি কখন কোন দোষ বা অসন্তোষের কার্য্য করিয়া থাকি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে।" দিনময়ীকে বিদ্যাসাগর যথোচিত মর্যাদা দিতেন, সেও নিছক স্ত্রী হিসাবে নয়। দিনময়ী মূলত ঘরকন্নার কাজে থাকলেও বিহারীলাল সরকার তাঁর গুণাবলী প্রসঙ্গে লিখে গেছেন, মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা এবং চারিত্রিক তেজস্বিতার কথা লিখে গেছেন।

বিদ্যাসাগরের মেয়ে বিনোদিনীর সাথে বিয়ে হয়েছিল শিক্ষক সূর্যকুমার অধিকারীর। বিদ্যাসাগর এই জামাইকে খুব ভালবাসতেন তার নানা দক্ষতা-যোগ্যতার জন্য। ১৮৭৬ সালে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের সব দায়িত্ব তিনি সূর্যকুমারকে দেন। খুবই দক্ষতার সাথে সূর্যকুমার সে দায়িত্ব পালন করছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তহবিল সংক্রান্ত একটা সমস্যা দেখা দেয়। সূর্যকুমার টাকাপয়সার যথাযথ হিসাব দিতে ব্যর্থ হন। কোনও আপস না করে বিদ্যাসাগর সঙ্গে সঙ্গে তাকে ইস্তফা দিতে বলেন এবং বৈদ্যনাথ বসুকে ওই পদে দায়িত্ব দেন।

বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের প্রবর্তক শুধু নন, কঠিন বাধা অতিক্রম করে অসংখ্য বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা তিনি করে দিয়েছেন। বিধবাবিবাহ করবে বলে বহু লোক তাঁকে ঠকিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বিদ্যাসাগর বলেছেন, ঠকা ভাল কিন্তু ঠকানো ভাল নয়। এইরকম একটা পরিস্থিতিতে কোনও কারণে বীরসিংহে একটি বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগর মত দিলেন না। অথচ তাঁর দুই ভাই তাঁর সাথে কোনও আলোচনা না করে, কোনও কিছু তাঁকে না জানিয়ে, গ্রামের কয়েকজনের মদতে গোপনে সেই বিধবাবিবাহ দিয়ে দেন। এহেন নিকৃষ্ট আচরণের জন্য বিদ্যাসাগর খুব কষ্ট পান। আত্মীয় ও গ্রামবাসীদের জন্য এত কিছু করা সত্ত্বেও তাদের থেকে এতটা অপমান তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। গভীর দুখের সাথে তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'এখানকার হাসপাতাল, স্কুল এবং অন্যান্য যেখানে যা সাহায্য আমি দিই তা যথারীতি দিয়ে যাব, কিন্তু বেঁচে থাকতে আর কোনোদিন এই গ্রামে আসব না।' বাস্তবে সেদিনের পর আর কোনোদিন বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর যাননি। পরবর্তী কালে কলকাতায় হঠাৎ করেই একদিন 'বীরসিংহ জননীর পত্র' নামে একটি পুস্তিকা তাঁর হাতে আসে। শোনা যায়, গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে ছাপানো পুস্তিকা আকারে এই দীর্ঘ পত্র লিখে বিদ্যাসাগরকে গ্রামে আসার সকাতর অনুরোধ করেছিলেন। এই লেখা পড়ে বিদ্যাসাগর গ্রামে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু শারীরিক অত্যন্ত অসুস্থতার কারণে আর যেতে পারেননি।

(চলবে)

এনআরসি-সিএএ-র বিরুদ্ধে গবেষকদের প্রতিবাদ

এনআরসি এবং সিএএ-র বিরুদ্ধে ৯ জানুয়ারি কলকাতায়, কলেজ স্ট্রিটে গবেষক সংগঠন ডিআরএসও আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভায় এ কথা বলেন আহ্বায়ক বেঙ্গালুরুর আইসিটিএস-এর গবেষক ডঃ অর্ঘ্য দাস। এই বিক্ষোভে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, জে এন ইউ-এর প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, আইএসআই, এসআইএনপি, এসএনবিএনসিবিএস, বোস ইনস্টিটিউট, আইএসিএস, সি ইউ, জেইউ, ভি ইউ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে গবেষকরা এসেছিলেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন আইআইএসআই-এর অধ্যাপক পার্থসারথি রায় এবং সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সহ সম্পাদক অংশুমান রায়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

‘গো ব্যাক মোদি’। হাজার হাজার মানুষের স্লোগানে মুখরিত কলকাতা থেকে জেলা

মালদা

নদীয়া

শিলিগুড়ি

একের পাতার পর

১১ জানুয়ারিতে আবার দেখা গেল, দেশের মানুষের উপর সাম্প্রদায়িক বিভাজনের নীতি এনআরসি-সিএএ-এনপিআর চাপিয়ে দেওয়ার প্রধান কারিগর নরেন্দ্র মোদিকে চায় না কলকাতা, চায় না বাংলা। সে কথাই মানুষ সোচ্চারে জানিয়ে দিল প্রতিবাদের গর্জনে। উঠল স্লোগান গো-ব্যাক নরেন্দ্র মোদি। কুশপুতুলে আগুন দিয়ে মানুষ সোচ্চারে বলল, ফ্যাসিস্ট মোদি ফিরে যাও।

মোদির বিমান কলকাতার মাটি ছোঁয়ার কথা ছিল তিনটে নাগাদ। কিন্তু বেলা আড়াইটাতেই কলকাতার এসপ্ল্যানেড অবরুদ্ধ। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর শয়ে শয়ে কর্মী-সমর্থকের হাতে ব্যানার ‘ক্ষুদিরামদের বাংলায় নাথুরামদের ঠাঁই নেই’। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের হাত তুলে ধরেছে কালো পতাকা, তাতে স্পষ্ট ঘোষণা— নরেন্দ্র মোদি ফিরে যাও। সন্তানের হাত ধরে এসেছেন মা। তাঁর গলার সাথে মিলে যাচ্ছে কিশোর কণ্ঠের স্লোগান। সেই ছিদ্রান্বেষীরা— যারা বারবার ছাত্ররা কেন প্রতিবাদের অঙ্গনে আসবে, এই নিয়ে নাকে কান্না কাঁদে, মানুষের অধিকার, মনুষ্যত্বকে বাঁচানোর এই মিছিলের সামনে তারা আজ কোথায়! বিশাল পুলিশ বাহিনী রাজভবনের দিকে গড়ে তুলেছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়। তাকে উপেক্ষা করেই মিছিল দখল নিল গোটা রাস্তার। এসপ্ল্যানেড-লেনিন সরণির মোড় অবরোধ করে চলল প্রতিবাদের ঝড়। নরেন্দ্র মোদির কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করলেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলার মধ্যে এলাকার হকার, দোকানদার, সাধারণ মানুষ অনেকেই তখন হয়ে উঠেছেন বিক্ষোভের শরিক। শ’য়ে শ’য়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে উঠছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের বার্তা দিয়ে। অবরোধের পর মিছিল যখন মৌলালি মোড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে, তাতে সামিল হলেন দলের কর্মী-সমর্থকদের বাইরেও অনেক মানুষ।

ওইদিন সমস্ত জেলা সদর সহ অসংখ্য শহর, গঞ্জ, বাজারে একইভাবে এস ইউ সি আই (সি) বিক্ষোভের কর্মসূচি নিয়েছিল। সব বিক্ষোভেই সামিল হয়েছেন সাধারণ মানুষ।

জেএনইউ গেটে ছাত্রছাত্রীদের সমর্থনে এআইডিএসও

কলকাতা বন্দরকে শ্যামাপ্রসাদ নামাঙ্কিত করার তীব্র প্রতিবাদ এস ইউ সি আই (সি)-র

কলকাতা বন্দরের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে এটিকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামাঙ্কিত করার পরিপ্রেক্ষিতে এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৩ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, ‘কলকাতা বন্দরের নাম যেভাবে প্রধানমন্ত্রী আকস্মিক ঘোষণায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামাঙ্কিত করলেন তা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত অগৌরবজনক। আরএসএস-হিন্দু মহাসভা-সঙ্ঘ পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কেবল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখেননি, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি এমন কথাও বলেছিলেন যে ভারত যদি ভাগ নাও হয় তিনি বাংলা ভাগের পক্ষপাতী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজি যখন প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারতকে স্বাধীন করার চেষ্টা করছিলেন ঠিক সেই সময় তৎকালীন বাংলা সরকারের মন্ত্রী হয়ে তিনি ভারতীয়দের ব্রিটিশ সৈন্যদলে যোগ দেওয়ানোয় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এমন একজন বিতর্কিত মানুষের নামে কলকাতা বন্দরের নাম রাখা কোনওভাবেই যুক্তিযুক্ত ও বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা এই ঘোষণার তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে তা প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি।’

স্টেট ব্যাঙ্কের এটিএম-এ কর্মরত সুরক্ষা কর্মীদের বেতন নিয়ে টালবাহনা

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এটিএম-এ কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীদের বেতন প্রদান নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানবাহানা চলছে। ব্যাঙ্ক এবং ভেন্ডাররা (কন্ট্রাকটর) দু’মাস অন্তর বেতন দিচ্ছে। ফলে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত বেতন না পাওয়ার ফলে তাঁরা অর্থনৈতিক ভাবে খুবই দুরবস্থার মধ্যে পড়েছেন। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে কর্মচারীরা কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পতাকাতলে সংগঠিত হচ্ছেন এবং আন্দোলন গড়ে তুলছেন। এসবিআই-এর রায়গঞ্জ, বারুইপুর আঞ্চলিক অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এবং শিলিগুড়ি আঞ্চলিক অফিসে ফোরামের নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়ার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। ডেপুটেশনগুলিতে নেতৃত্ব দেন কমরেড গোপাল দেবনাথ, কমরেড মনোজ মণ্ডল ও অন্যান্যরা।

কর্ণাটকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজ বয়কটের ডাক আশা কর্মীদের

৩ জানুয়ারি বেঙ্গালুরু শহর সাক্ষী থাকল এক ‘গোলাপী প্লাবনে’র। এদিন কর্ণাটকের এই রাজধানী শহরে মাসিক ন্যূনতম ১২ হাজার টাকা সাম্মানিক ও ১৫ মাস ধরে বকেয়া ভাতার কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় অংশের দাবিতে ‘কর্ণাটক রাজ্য সংযুক্ত আশা কার্যকর্ত্যারা সংঘ’-এর ডাকে প্রায় ৩০ হাজার গোলাপী শাড়ি পরিহিতা আশা কর্মী সামিল হয়েছিলেন এক বিশাল মিছিলে। রেলস্টেশন থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি ফ্রিডম পার্কে পৌঁছায় এবং সেখানে অনির্দিষ্টকালের জন্য দিবারাত্র ধরনায় বসেন আশা কর্মীরা।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কে রাধাকৃষ্ণ, এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক কে উমা সহ নানা গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভাপতিত্ব করেন কর্ণাটক রাজ্য সংযুক্ত আশা কার্যকর্ত্যারা সংঘের রাজ্য সভাপতি কে সোমশেখর ইয়াডাগিরি।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মীদের এক প্রতিনিধিদল ধরনাস্থলে আসেন এবং স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। তাঁরা জানান, স্বাস্থ্য মন্ত্রক আশা কর্মীদের সাম্মানিক ১ হাজার টাকা বাড়ানোর সুপারিশ করেছে। বকেয়া টাকাও কর্মীদের দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতিতে দাবি পূরণ হবে না বুঝে, যতদিন না বকেয়া টাকা প্রত্যেক আশা কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসছে, ততদিন কাজ বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com